ছোটোদের উপন্যাস

ফুলঝুরি

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

গ্রামের নাম সুধন্যপুর ৯
ভাইবোন ৩২

গ্রামের নাম সুধন্যপুর

কাল তোদের বলেছিলাম, মোগল বাদশার কাছে ব্যবসার অনুমতি পাবার পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলি নদীর ধারে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা নামে তিনটি গ্রাম স্থানীয় জমিদারদের কাছে কিনে নেয়। সেইসময় আমাদের দেশে খুব অরাজকতা চলছিল। দুর্বল মোগল বাদশা এত বড়ো দেশকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিল। ধূর্ত ব্রিটিশরা অল্পদিনেই পরিস্থিতি বুঝে গেল এবং নানান অছিলায় নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করে দিল। এইভাবে একসময় ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল ভারতবর্ষে। আমি আজ তোদের জমিদারি প্রথা কিভাবে এল সে ব্যাপারে বলবো! তার আগে বল দেখি, আমি জমিদার বাড়ির ছেলে তোরা ছোটোরা কি জানিস?

রূপম বলল, জানি স্যার। আমাদের ক্লাসের বন্ধুরা সবাই জানে। বেশি ছোটোরা জানে না মনে হয়।

সোনাই হাত তুলে বলল, আমিও জানি স্যার। তুমি জমিদার বলেই তো এই বাড়িতে থাকো।

স্যার হেসে বললেন, ঠিক বলেছিস। রূপম তুই কিন্তু ফেল করে গেলি। বেশি ছোটোরাও জানে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম আমাদের গ্রামের নাম সুধন্যপুর। সবুজ গাছ-গাছালিতে ছাওয়া এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটি এই গ্রামের বাসিন্দা সুধন্য রায়চৌধুরীর নামাঙ্কিত। আগে এই গ্রামের নাম ছিল দরিয়াপুর। হঠাৎ নামটা বদলে গেল কেন? একটা কথা জেনে রাখিস যে কোনো গ্রাম, শহর বা আধা শহর - সবকিছুর নামের পিছনে কোনো না কোনো প্রচলিত গল্প বা ইতিহাস আছে। দরিয়াপুর নামের পিছনে কি কারণ হতে পারে, কে বলতে পারবি?।

আনিস হাত তুলে বলল, আমি বলবো স্যার। দরিয়া মানে সমুদ্র বা বড়ো নদী। আমাদের গ্রামের কাছে সমুদ্র নেই, কিন্তু পাশ দিয়ে বড়ো নদী অজয় বয়ে গেছে।

—অজয়কে ঠিক বড়ো নদী বলা যায় না। যাই হোক কে বলতে পারবি দরিয়া শব্দটা কি বাংলা?

রুমি হাত তুলে বলল, না স্যার, উর্দু।

স্যার বললেন, গুড, ঠিক বলেছিস। তবে শুধু অজয় নদীর জন্য নয়, আমাদের গ্রামে বহু পুকুর আর দীঘি আছে, তাছাড়া এখানে বহু মুসলমানের বাস। সেটাও একটা কারণ হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, কি এমন ঘটলো, যে কারণে দরিয়াপুরের নাম বদলে সুধন্যপুর হলো? সেই গল্পই এখন তোদের বলবো। মন দিয়ে শুনবি—

সুধন্য রায়চৌধুরী এই জমিদার পরিবারের ছেলে ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষ শৈলশেখর রায় অনেক জমিজমার মালিক হলেও প্রজাদরদী মানুষ ছিলেন। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রশাসক লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারি প্রথা চালু করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী জমির মালিক জমিদার, চাষী প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা বা ট্যাক্স আদায় করবেন। সেই ট্যাক্স-এর কিছু অংশ ব্রিটিশ রাজকোষে জমা দিতে হবে। যে জমিদার যত খাজনা জমা করতে পারবে, তার তত খাতির হবে। বেশি খাজনা আদায়ের জন্য গরিব প্রজাদের ওপর অত্যাচার বেড়ে গেল। শৈলশেখর রায় ব্রিটিশদের কাছে খাতির পাবার কোনো চেষ্টা করেননি। কিন্তু তিনি মারা যাবার পরে তাঁর ছেলে ব্রিটিশদের স্নেহধন্য সুবর্ণ রায়চৌধুরী ব্রিটিশদের খুশি রাখার জন্যে যেমন গোলামী করেছেন, নিজের প্রজাদের প্রতিও তেমনি অমানবিক অত্যাচার করতেন। এইভাবে তিনি ব্রিটিশদের তোয়াজ করে রায় থেকে রায়চৌধুরী পদবি জোগাড় করে ফেললেন। এই পর্যন্ত বলে সুনন্দ স্যার পাশের টেবিলে রাখা জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে একনিশ্বাসে পুরো জল শেষ করে জানলার বাইরে আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সূর্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের আলো জানলার কাঁচে বর্ণালী তৈরী করছে। এবার পাখিরা দল বেঁধে বাসায় ফিরবে। কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠবে এই রায়চৌধুরী বাড়ির বাগান। কোন গাছ নেই এখানে? বিশাল বাড়িটার অর্ধেক অংশই ভেঙে পড়েছে। বাকি অংশে থাকেন সপরিবার সুনন্দ স্যার। পরিবার বলতে স্যারের বৃদ্ধা মা, কাকিমা আর স্যারের দশ বছরের ভাইপো সূর্য আর কাজের লোকজন। একমাত্র বোন সমীক্ষা থাকে বিদেশে। কাকা সাতবছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছেন। বাবা সুদর্শন রায়চৌধুরী দেড়বছর আগে করোনায় মারা গেছেন।

রিঙ্কুর প্রশ্নে বাস্তবে ফিরলেন স্যার।

—স্যার, আজ কি আমাদের ছুটি হয়ে গেল?

রুপাই জিজ্ঞেস করলো, স্যার সোমবার থেকে স্কুল খুলে যাবে। তোমার কাছে কখন পড়তে আসব আমরা?

সুনন্দ বললেন, কোভিড-এর জন্য এতদিন স্কুল বন্ধ ছিল বলে তোদের কোচিং করছিলাম। স্কুল খুলে যাচ্ছে, এরপরে সবাই পুরনো রুটিনে ফিরে যাব। আমার সঙ্গে স্কুলে তো রোজ দেখা হবে। পড়াশুনোর ব্যাপারে যদি কোনো সমস্যা হয়, চলে আসবি আমার কাছে। বাকিটা স্কুল খোলার পরে ঠিক করা যাবে।

পিঙ্কি বলল, না, স্যার। আমরা আপনার কাছে আসতে চাই।

রাবেয়া বলল, পিঙ্কি ঠিক বলেছে স্যার। স্কুল খুললেও আমরা আপনার কাছে পড়তে আসব। পড়া ছাড়াও কত গল্প বলেন আপনি। আমরা কত কিছু জানতে পারি। সেসব তো স্কুলে হবে না।

স্যার বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভেবে দেখছি কি করা যায়। আজ শুক্রবার। কাল-পরশু দুদিন তো এখানে ক্লাস হবে! হ্যাঁ, জমিদারি প্রথা নিয়ে বলছিলাম। সুবর্ণ রায়চৌধুরী খেতাব পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন। অত্যাচারী জমিদার হিসেবে মানুষের অভিশাপ কুড়োলেন। মারাও গেলেন সাপের কামড়ে। জমিদারি এল তাঁর ছেলে সত্যসুন্দরের হাতে। তিনি বাবার মত অত লোভী ছিলেন না বলে প্রজারা যেমন কিছু স্বস্তি পেল, জমিদারির আয়ও কমে গেল। ব্রিটিশদের কাছে গুরুত্বও কমে গেল। কিন্তু তিনি কিছু ভালো কাজ করে ফেললেন। দাদু শৈলশেখরের নামে গ্রামে একটা স্কুল করে দিলেন। আর অজয়ের পারে একটা শিবমন্দির তৈরী করলেন, তার সঙ্গে বাঁধানো ঘাট। শিবমন্দির, ঘাট এগুলো তোরা নিশ্চয় দেখেছিস।

সবাই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ স্যার।

—তাছাড়াও তিনি বেশ কিছু জমি গ্রামের উন্নয়নের কাজের জন্য দান করে দিলেন। তাঁর ছেলে সুধন্য আবার একেবারে অন্যরকম মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। কলকাতায় আইন কলেজ থেকে পড়াশুনো করে গ্রামের মানুষের সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইংরেজদের অত্যাচারে তখন ভারতের মানুষ একটু একটু করে জেগে উঠছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। সেইসময় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। এরপরে—

সুনন্দ স্যার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন কথা বলতে বলতে খেয়াল হয়নি, সন্ধে

হয়ে গেছে। বাইরে বেশ অন্ধকার। আর দেরি করা ঠিক হবেনা। এরা যথেষ্ট ছোটো। সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি বললেন, তোরা এবার বাড়ি যা, সন্ধে হয়ে গেছে। কাল দেখা হবে।

—গল্পটা শেষ হলো না তো স্যার।

—কাল শোনাবো। আজ যা যা হোম–ওয়ার্ক দেওয়া আছে বাড়ি গিয়ে শেষ করে নিবি কিন্তু। আরেকটা কথা, ইস্কুলে অবশ্যই মাস্ক পরে যাবি, জলের বোতল, টিফিনও নিয়ে যাবি। কারণ এখন মিড-ডে মিল পাবি কিনা ঠিক নেই। আনিস, রুমি, রূপম, তোরা বড়রা ছোটোগুলোকে বাড়িতে পৌঁছে দিবি কিন্তু।

২

কলরব করতে করতে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে গেল। বিশাল হলঘরের দরজাটা বন্ধ করে সুনন্দ লক্ষ করলেন সূর্য মনমরা হয়ে চুপটি করে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

সুনন্দ সস্নেহে সূর্যর মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রে সূর্য?

গোমড়া মুখে সূর্য বলল, ওরা আর সোমবার থেকে আমাদের বাড়িতে আসবে না জেঠু?

সুনন্দ মৃদু হেসে বললেন, দূর বোকা, আসবে না কেন। হয়তো রোজ আসবে না। ওরা না এলে তোর মনখারাপ হবে?

—হ্যাঁ জেঠু। ক্লাস শুরু হবার আগে আমরা কত খেলা করি, মজা করি।

—জানি তো। স্কুল খুলে গেলে দেখবি আরও মজা হবে। ওখানে ক্লাসের সব বন্ধুদের পেয়ে যাবি। এখানে তো সবাই আসতে পারে না। ওসব ভেবে মনখারাপ করতে নেই। চল, ভেতরে যাই। এবার সিরিয়াস কথা। আধঘন্টা যা খুশি করতে পারো। তারপরে কিন্তু হোম-ওয়ার্ক শেষ করতে হবে।

সূর্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বড়ো ঠাম্মার ঘরের দিকে চলে গেল। সুনন্দ লাইব্রেরিতে চলে গেলেন। এটাই তাঁর স্টাডি। ল্যাপটপ খুলে বসলেন। এই গ্রাম এবং তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস ভবিষ্যতে হয়তো কারোর কাজে আসতে পারে, হয়তো আসবে না। তবু তিনি লিখে যেতে চান। গত একমাস ধরে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে এই গ্রামে। ক্লাস ফাইভ থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে হোস্টেলে থেকে পড়া। মেধাবী ছাত্র

সুনন্দ কলকাতায় মাস্টার ডিগ্রি করার পরে বাবা মা চেয়েছিলেন, লন্ডনে পড়াশুনো করে আসুক। সুনন্দর মাধায় তখন দেশপ্রেমের ভূত চেপে বসেছে। তিনি বিদেশে পড়তে যেতে রাজী হলেন না।

বললেন, বি.এড করে স্কুলে ছাত্র পড়াবেন আর মানুষের জন্য কাজ করবেন। মা বিশাখা মনঃক্ষুন্ন হলেও বাবা নিরুৎসাহ করেননি। বলেছিলেন, যা ভালো মনে হবে, তাই করো। জীবনে কখনো আপসোস করোনা। কারণ সময় কখনো ফিরে আসেনা।

বিষণ্ণ বিশাখাকে বুঝিয়েছিলেন, জেনেটিকস তো অস্বীকার করতে পারবে না। ভুলে যেয়ো না, ও সুধন্য রায়চৌধুরীর বংশধর। মনে নেই, ছোটোবয়স থেকেই চাষা ভূসো নিচু জাতের লোকদের সঙ্গে কেমন অবাধে মিশে যেত। ওর অকাট্য যুক্তির কাছে সবাই হার মেনে যেত।

বিশাখা বললেন, আমার ধারণা ছিল এতদিন অন্য পরিবেশে থেকে কিছু পরিবর্তন হয়েছে হয়তো। এই গাঁয়ে থেকে কি ভবিষ্যত হবে বলো তো। এত লেখাপড়া করে স্কুল মাস্টারি করে জীবন কাটিয়ে দেবে। এর চেয়ে তো তোমার রাইস মিলের দায়িত্ব নেওয়া ভালো।

সুনন্দ বিদেশে পড়তে গেলেন না। কিন্তু মায়ের আশা পূর্ণ করলেন একমাত্র বোন সমীক্ষা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনে চলে গেলেন হায়ার স্টাডি করতে। দেশে আর ফিরলেন না, ওখানেই থেকে গেলেন। একটি ব্রিটিশ ছেলের সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল। সে বিয়ে ভেঙে যাবার পরে বাবা মা খুব চেষ্টা করেছিলেন মেয়েকে দেশে ফিরিয়ে আনতে।

বাড়ির সবাই বলেছিলেন, এদেশে ডাক্তারের কত অভাব, তুই ভালো করেই জানিস। হায়ার স্টাডির জন্য বিদেশে গেছিলি, ঠিক আছে। নিজের দেশের কথা ভাববি না? আমাদের গাঁয়েই স্পেশালাইজড কোনো ডাক্তার নেই। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা না পেয়ে মারা যায়। ব্যবস্থা করে শহরে নিয়ে যেতে যেতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তোর তো কিছুই অজানা নয়। মানুষের সেবা করা একজন ডাক্তারের প্রথম কর্তব্য। আর তুই....

সমীক্ষা বলেছিলেন, আমি ওদেশে একটা চ্যারিটেবল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত আছি। মানবসেবার কাজই করছি।

সুনন্দ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ওদেশে কেন? নিজের দেশে কেন নয় ?

উন্নত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও উন্নত। ওখানে তুই কাজ না করলেও ওদের কোনো ক্ষতি হবে না। আর এখানে থাকলে গরীব মানুষগুলোর উপকার হবে।

—এদেশ ওদেশ মানিনা আমি দাদা। আমি মনে করি পুরো পৃথিবীটাই আমার দেশ। দেশ ভাগাভাগি মানুষ করেছে। আর দাদা, গরীব মানুষ সব জায়গাতেই এক। আমি মনেপ্রাণে আন্তর্জাতিক। সেইজন্যে—বলে সমীক্ষা ওই প্রসঙ্গেই ইতি টেনে দিয়েছিলেন।

সমীক্ষা ফিরলেন না। দু-তিনবছর পরপর গ্রামে আসেন মাসখানেকের জন্য। করোনার জন্য গত দুবছর আসেননি।

কাকা সুরঞ্জনের একমাত্র ছেলে সুপর্ণ খড়্গপুর আই আই টি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হায়ার স্টাডিজের জন্য আমেরিকা গেছিলেন। ওখানে পরিচয় হয় আমেরিকান মেয়ে সুজানের সঙ্গে। সুজান আগে থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ছোটোবয়সে বাবা -মার সঙ্গে কয়েকবছর উত্তরকাশীতে একটা যোগাশ্রমে কাটিয়েছিলেন। সুজানের রিসার্চ-এর বিষয়ও ছিল ইন্ডিয়ান হারমিটস। ওদেশে বিয়ে করে ওরা দুজনেই ভারতে ফিরে দিল্লিতে চাকরি করছিলেন। সুপর্ণর বাবা-মায়ের তীব্র আপত্তি ছিল ছেলের এই বিয়েতে। সুজানের ইচ্ছা ছিল গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের উন্নতির জন্য কিছু কাজ করার। সুনন্দ খুশি হয়েছিলেন এটা জেনে। কিন্তু কাকা-কাকিমা বেঁকে বসায় সেটা সম্ভব হয়নি। এমনকি প্রথম দেশে ফেরার পরে ওরা যখন গ্রামে এসেছিলেন, সাতদিনের বেশি থাকতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাকিমা অনশনে বসেছিলেন। বাধ্য হয়ে ওরা দিল্লি চলে গেলেন।

সূর্য হবার সময় বিশাখা কিছুদিন দিল্লিতে ছিলেন ওদের কাছে। কাকা সুরঞ্জন আর কাকিমা মমতা দিল্লি গেলেন সুজান মারা যাবার খবর পাবার পরে। বাচ্চা হবার একমাসের মাথায় একদিনের অজানা জ্বরে মারা গেলেন সুজান। সুনন্দরা সবাই ছুটে গেলেন দিল্লি। সুজানের মৃত্যুশোক সহা করতে পারলেন না সুপর্ণ। দিল্লিতেই সুজানের কাজটাজ হয়ে যাবার পরে সুনন্দর হাতে সূর্যকে তুলে দিয়ে সুপর্ণ বললেন, দাদা, তোমরা একে মানুষ করো।

সুনন্দ জিজ্ঞেস করলেন, আর তুই?

সুপর্ণ বললেন, আমি আমার ব্যবস্থা করে নিয়েছি দাদা। উত্তরকাশীতে একটা আশ্রমে আমি আর সুজি মাঝে মাঝে যেতাম, সেখানেই থাকবো।